গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম : উদ্ভব, বিকাশ, অধঃপতন

দীপঙ্কর দাস

বিষ্ণু বা নারায়ণ হলেন পৌরাণিক দেবতা। যদিও ঋক্‌বেদেই দেব ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু সেইসব দেবতা পরবর্তীকালে অপ্রধান হয়ে যান এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন দেবতা উঠে আসেন প্রথম সারিতে। আরও পরে ব্রহ্মার প্রতিপত্তি হ্রাস পায়, বিষ্ণু ও শিবকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বৈষ্ণব ও শৈব আরাধনার রীতি (cult)। কিন্তু শিব আদৌ আর্য দেবতা নন। আর্য আগমনের পূর্বেই সিন্ধু উপত্যকায় পশুপতি এবং যোগীরাজ শিবের পূজা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও লিঙ্গ ও যোনি পূজাও ছিল। বেদে যে রুদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা পরবর্তী কালে শিব সত্তার অঙ্গীভূত হয় এবং শিবকে নিয়ে বহু বিচিত্র মিথের জন্ম দেয়। পৌরাণিক যুগে আসমুদ্র হিমাচলে বিষ্ণু ও শিবের পূজা প্রচলিত ছিল নানা নামে। পরে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী বা নারায়ণী এবং শিবশক্তি দুর্গা চণ্ডী কাত্যায়নীর যুগপৎ পূজা প্রচলিত হয়।

বিভিন্ন পুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোকের উদ্ধৃতি দেখা যায়, 'আপো নারা ইতি (প্রাক্তো আপো বৈ নর সূনরঃ/অয়নং তস্য তা পূর্বং তেন নারায়ণঃ।' নার বা জল সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন এবং নার পুরুষের অয়ন হিসেবে তাঁর নাম নারায়ণ।

বিভিন্ন পুরাণে সৃষ্টির বিকাশ সম্পর্কে কিছু ভিন্নতা থাকলেও মোটামুটিভাবে 'সৃষ্টি হল নির্গুণ, নির্বিশেষ, সচ্চিদানন্দ, বিভু পরমেশ্বরের লীলা। তাঁর অনন্ত শরীরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, কালচক্র, সুরা-সুর-নর, ধর্মা-ধর্ম, শাস্ত্র, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সব কিছুর অবস্থিতি। তিনি এক দেহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অর্থাৎ স্রষ্টা, পালক ও সংহর্তা। এই পরমেশ্বর বিভু প্রথমে জল সৃষ্টি করে তার মধ্যে বীজ নিক্ষেপ করেন, তা থেকে প্রাকৃত স্বর্গ রূপে একটি হিরণ্ময় অণ্ডের উৎপত্তি হয়। এই অণ্ডই হল ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে নির্গত হয়ে তিনি সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করলেন এবং অনন্ত সলিলে শয়ন করলেন। ইনিই নারায়ণ। নারায়ণের নাভিপদ্মে জন্ম হল ব্রহ্মার এবং ব্রহ্মা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সৃষ্টি করলেন আদিমানব মনু এবং আদি মানবী শতরূপাকে। অতঃপর স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে সন্তান-সন্ততি সৃষ্টির প্রথা প্রবর্তিত হল। এই সৃষ্টি তত্ত্ব থেকে স্পষ্ট হয় যে স্ত্রী পুরুষের মিলন ছাড়া সৃষ্টি অসম্ভব। কিন্তু আর্য প্রভাবে এই স্ত্রীশক্তি গোড়ার দিকে তুল্য দৈবী সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। সম্ভবত শিব-শক্তি তত্ত্বের প্রভাবে পরবর্তীকালে লক্ষ্মী-জনার্দনের ধারণা (Concept) দেখা দেয়।

সুকুমার সেন মশাই ঋক্‌বেদের কিছু কিছু সূক্তের রচনাকাল ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং বেশিরভাগ সূক্ত খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রচিত এবং সংকলন কাল ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কারণ নির্দেশ করেননি বা তথ্যসূত্র দেননি। অতুল সুর মশাই কার্বন ১৪ পদ্ধতিতে নির্ণীত সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে উপরের স্তরের বয়স

১৯৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বলে জানিয়েছেন। একথা সর্ববাদী সম্মত যে সিন্ধু সভ্যতা বিনষ্ট হয়েছিল নর্ডিক আর্যদের দ্বারা। সুতরাং আর্যরা ঋক্‌বেদের কিছু সূক্ত কণ্ঠে নিয়ে এসেছিলেন, সুতরাং ঋক্‌বেদের প্রাচীন সূক্তগুলি ১৯৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তারও আগে রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঋক্‌বেদের শেষাংশ এবং সাম-যজু-অথর্ব রচিত হয়েছে এদেশের মাটিতে। ঋক্‌বেদের সংকলন কাল সম্পর্কে সুকুমার সেন মশাই যে মন্তব্য করেছেন তার ভিত্তি ভাষাতত্ত্ব, তবে এ বিষয়েও আলোচনা বিশদ নয়। যাই হোক অন্য প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এই প্রতিপাদ্য মেনে নিলেও পুরাণের রচনা ও সংকলন কাল সম্পর্কে ধন্দ্ব কাটে না। সুকুমার সেন মশায়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য : 'পুরাণ-নাম দেওয়া গ্রন্থগুলি বিভিন্ন কালে রচিত ও সংকলিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম পুরাণের সংকলন কাল ৪০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যাইবে না। অর্বাচীনতম পুরাণ ঊনবিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা। পুরাণগুলিতে বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্য স্থাপিত হইলেও বিষ্ণুই সমস্ত পুরাণের অধিদেবতা। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে শিব প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম কাহিনি সংবলিত পুরাণগুলি পরবর্তীকালে বিষ্ণুদৈবত পুরাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এ নেহাৎ অনুমান মাত্র। অধিকাংশ পুরাণে বিষ্ণুর অবতারবাদ প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। মহাভারতে সংকলিত হয় নাই এমন অনেক আখ্যান পুরাণগুলিতে আছে, অন্য অনেক কাহিনীও আছে। সেসব কাহিনী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-লইয়া দেবতা ও অসুরের জন্ম-কর্ম-বিরোধ লইয়া, সূর্য ও চন্দ্রবংশের কল্পিত ইতিহাস লইয়া ও চতুর্দশ মনুর অধিকার কাহিনি লইয়া। তাই পুরাণকে বলা হয় পঞ্চলক্ষণ' [ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮৪] যদিও ভিন্ন মতে পুরাণ দশলক্ষণ যুক্ত। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মশায়ের মতে : 'বৈদিক সাহিত্যে পুরাণ কাহিনির বীজ ইতস্তত ছড়ানো আছে। অতএব পুরাণ চির পুরাতন। কিন্তু যে আকারে পুরাণগুলি পাওয়া যাইতেছে, তাহা খুব প্রাচীন নয়। পুরাণের আদি সংকলক ছিলেন বেদব্যাস, সে সংকলনের অল্পই অবশিষ্ট আছে। গুপ্ত যুগে (৩২০-৪৬৭ খৃষ্টাব্দ, লেখক) পুরাণ নূতন করিয়া সংকলিত হইয়াছিল। বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলি গুপ্ত যুগেরও পরবর্তী, কোথাও বা আরও পরবর্তী। ফলে সূতাদির বিবৃত বলিয়া 'পুরাণ' নামে যে বিশাল পল্লবিত সাহিত্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিভিন্ন যুগের নানা স্তর সংযোজিত হওয়ায় বিষয় বৈচিত্র্যে তাহা বহু বিস্তৃত।' [প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বাঙালির উত্তরাধিকার পৃষ্ঠা ২৪৫]।

অতুল সুর মশায়ের মতে বুদ্ধের জন্মের ঢের পূর্বকাল থেকে 'গাথা', 'নারশংসি', 'আখ্যান' ও 'পুরাণ' সূত ও মাগধজন কর্তৃক গীত হত। বুদ্ধের আবির্ভাবের পর এইসব কাহিনির কিছু কিছু জাতকের কাহিনি রূপে সংকলিত হয়। 'খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটদের উত্থানের পর এই রীতির একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, সূত ও মাগধরা সমাজে অবনমিত হয়। তাদের স্থান গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। তাঁরা রচনা করতে থাকেন পুরাণ সমূহ। ইতিহাস এখন শোনা কথা থেকে লিখিত রূপ ধারণ করে।' [হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪৮]।

সুতরাং সুকুমার সেন মশায় যে মন্তব্য করেছেন, 'পুরাণ ৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যাইবে না, তা অবশ্যই লিখিত ব্রাহ্মণ্য পুরাণ প্রসঙ্গে।' অপর দুই প্রবক্তার সঙ্গে এই মন্তব্যের বিশেষ বিরোধ নেই। কিন্তু তাঁর মন্তব্যের 'সূর্য ও চন্দ্র বংশের কল্পিত ইতিহাস' প্রসঙ্গে অতুল সুর মশায় একেবারেই ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে রামায়ণ ও মহাভারত দুটি রাজবংশের ইতিহাস, পুরাণেও সে কথার সমর্থন আছে। আর একটি মন্তব্য 'পণ্ডিতেরা মনে করেন যে শিব প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য-কাহিনী সংবলিত পুরাণগুলি পরবর্তীকালে বিষ্ণু দৈবত পুরাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এ নেহাত অপমান মাত্র'—এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এ অনুমানের দৃঢ় ভিত্তি আছে। অতুল সুর মশায়ের কথায় 'নতুন পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান পেলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পূজিত হতে লাগলেন বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে পূজা পেতে লাগলেন তাঁদের স্ত্রী লক্ষ্মী ও দুর্গা। শিব আর্যদেবতা (সূর্যের প্রতিরূপ, চক্র প্রতীক, লেখক); শিব বা মহেশ্বর অনার্য দেবতা। এইভাবে নতুন ধর্মে আর্য ও অনার্য দেবতার অপূর্ব সম্মিলন ঘটল। প্রাগার্য কালের ন্যায় নারী দেবতাই বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। শিবের ভক্তরা শৈব ও বিষ্ণুর ভক্তেরা বৈষ্ণব নামে আখ্যাত হলেন। সমাজে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিরোধিতা ছিল না; কিন্তু পরে তা কোথাও কোথাও প্রকাশ পেল। তখন হরিহর মূর্তির কল্পনা করে ধর্ম ও সমাজ এই দুই-এর সংহতি রক্ষা করা হল। [হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, পৃষ্ঠা ৭৩]। বিরোধিতা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেছেন 'রাম-রাবণের যুদ্ধটাকে আমরা আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের যুদ্ধের প্রতিধ্বনি হিসেবেও ধরে নিতে পারি। এর আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। সেটা শিব বড় না বিষ্ণু বড় প্রমাণ করা। শিব অনার্য দেবতা, রাবণ তাঁর পরম ভক্ত। সুতরাং রাম বিষ্ণুর অবতার হিসাবে রাবণকে নিধন করার মানেই হচ্ছে শিব তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে পারেননি [ওই পৃ. ৫৯]।

মূল আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে বেদ-পুরাণের প্রাসঙ্গিকতা হল এই যে, বিষ্ণু পৌরাণিক দেবতা, চতুর্থ খ্রিস্টীয় শতক থেকে তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ হয়ে ওঠে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। পাশাপাশি শিবোপাসক শৈব সম্প্রদায়ও ছিল এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অন্ধ সমন্বয়ের চেষ্টাও জারি ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বঙ্গীয় সমাজে যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল তখনও কিন্তু শৈব ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং সমন্বয়ী চেষ্টাতেও ছেদ পড়েনি।

হিন্দু সমাজের আধারের ভিতর আরও একটি সাধন ধারা বহমান ছিল, তা হল 'তন্ত্র'। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তন্ত্রসাধন ধারারও একটি সম্পর্ক আছে। সুতরাং মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে 'তন্ত্র' সম্পর্কেও আলোচনা করা দরকার।

তন্ত্র একটি প্রাচীন সাধন পদ্ধতি, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হল সাধন প্রণালী, যন্ত্র, মণ্ডল, আসন, মন্ত্র, ন্যাস, ধ্যান, যোগ, মুদ্রা প্রদর্শন, বলি ও পূজা। তন্ত্রমতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় একই সত্ত্বা লীলা করে চলেছেন, তিনি আদি শক্তি বা মহাশক্তি। তত্ত্বগতভাবে ইনিও

পরমব্রহ্মের ন্যায় অব্যক্ত নির্গুণ ও নির্বিশেষ কিন্তু লীলা ক্ষেত্রে তিনি অনন্তরূপা। মানবদেহে তিনি নাদরূপ ব্রহ্ম এবং কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে বিরাজিত। কিন্তু জীবদেহে এই শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সাধন প্রক্রিয়ার দ্বারা ওই শক্তিকে উজ্জীবিত ও আয়ত্ত্ব করতে হয়। মোটের উপর তন্ত্র হল শক্তির আরাধনা।

তন্ত্র সাধনার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের অভিমত এই যে, 'মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় অবস্থিত মৃন্ময়ী স্ত্রী মূর্তিগুলি প্রমাণ করে, শক্তি সাধনা বৈদিক যুগের বহু পূর্বে অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত' [Prehistoric Anceient and Hindu India]।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত মশায়ের কথাতেও 'তন্ত্রাচারের উৎস আদিম এবং প্রথমদিকে তা দর্শন বা তত্ত্ব বিরোহিত আচার মাত্র ছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে সে সকল আচার গৃহীত ও দর্শনমণ্ডিত হয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রে পরিণত হয়েছে।' [Obscure Religious cult]।

তন্ত্রকে 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা' বলা হয়। বাস্তবে কাশ্মীর থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই বিদ্যার প্রাদুর্ভাব। তন্ত্রগ্রন্থের কয়েকটি বাংলাতেই পাওয়া গেছে এবং অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে বাংলা খণ্ডেই সেগুলি রচিত। কয়েকটি শাক্তপীঠও বাংলা-অসমে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যেও তন্ত্রাচার অজ্ঞাত নয়। বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের উদ্ভবক্ষেত্র বাংলা বলে অতুল সুর মশাই সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর মতে 'সব তন্ত্রের উপাস্য দেবতা ও উপাসনা পদ্ধতি এক নয়। কারুর উপাস্য দেবতা শিব, কারুর শক্তি, কারুর বিষ্ণু, কারুর সূর্য, আবার কারুর গণপতি।' [হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, পৃষ্ঠা ৮৯]।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মশায় আরও বলেছেন যে, 'প্রাচীন বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র গ্রন্থে বাসুদেবাদি তত্ত্বে শক্তি তত্ত্বের প্রভাব তো আছেই, এমনকি মহাপ্রভু প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্বেও শক্তিবাদের প্রভাব আছে।' [প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বাঙালীর উত্তরাধিকার, পৃষ্ঠা ২০৯]।

সুশীল দে মহাশয় ও নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন [Early History of Vaishnaba Faith and Movement; বাঙ্গালীর ইতিহাস]।

এই প্রসঙ্গ বিস্তৃত করার আবশ্যকতা নাই, কেবল এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা সহজিয়া সম্প্রদায়ও আছে, যাঁদের অভিচারসমূহ শব্দ প্রয়োগের দিক থেকে ভিন্ন হলেও মূলত তন্ত্রভিত্তিক এবং আজও গুহ্য ও দ্বৈতার্থক। সম্ভবত এই মত গড়ে উঠেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বিধিবদ্ধ হবার পর।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিধিবদ্ধ করেন ষড় গোস্বামী; দীক্ষা প্রণালী এবং অধ্যাত্ম দর্শনের সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যা এঁদের দ্বারাই হয়েছে। এঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা মূলত টীকারা বা ব্যাখ্যাতা। এঁরা সকলেই ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং কবিত্বগুণের অধিকারী।

স্বয়ং চৈতন্যদেব কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে এবং

হ্লাদিনী শক্তি রাধা সম্পর্কে নিজ উপলব্ধির কথা বিভিন্ন সময়ে অন্তরঙ্গজনের সাক্ষাতে প্রকাশ করেছেন মাত্র। তাঁর এই উপলব্ধি সম্পষ্টতই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয়টি সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তীকালের। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবনচর্যাকে আশ্রয় করে হওয়াই বিধেয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে নিমাই পণ্ডিতের জন্মসময় ও তারিখ বর্ণনা করেছেন। ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণের সময় জন্ম, ইংরিজি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে। বিভিন্ন বৈষ্ণব জনের রচনায় কিছু অলৌকিক অতিরঞ্জন আছে, সে সব বাদ দিলে যা থাকে, তা হল এই যে, চৈতন্য পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ শাস্ত্রপাঠ করে বিদ্বান হয়েছিলেন কিন্তু ষোলো বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন।' অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাঞি।/মূর্খ হই ঘরে মোর বহুক নিমাঞি।।' ছয়/সাত বছর বয়স পর্যন্ত নিমাই দুরন্তপনা করে বেড়ায়, কারও শাসন মানে না, ছ্যুৎ-অছ্যুৎ ভেদ করে না। তাড়না করলে বলে, আমি মূর্খ এসবের কি জানি! নাচার হয়ে শেষ পর্যন্ত তার শিক্ষার ব্যবস্থা হল। ৯ বছর বয়সে উপনয়ন। ১১ বছর বয়সে পিতৃহীন। ১৬ বছর বয়সে বিবাহ। নিমাই এতদিনে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছেন এবং টোল খুলে অধ্যাপনা করেন। বৈষ্ণবজনের উপরে তাঁর রীতিমতো আক্রোশ ছিল, কূট তর্কে তাঁদের অপ্রতিভ করার চেষ্টা করতেন। এই সময় এক পণ্ডিত এসে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। গঙ্গার তীরে বিচারসভা বসল। আগন্তুক পণ্ডিত একটি তাৎক্ষণিক গঙ্গার স্তব রচনা করে শোনালেন। শ্রুতিধর নিমাই পণ্ডিত তার তিন স্থানে অলঙ্কার দোষ দেখিয়ে তাঁকে পরাস্ত করলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ নিমাইকে 'বাদী সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করলেন। নিমাই একটি ব্যাকরণের টীকা রচনা করলেন, সেটি ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে স্বীকৃত হল। তারপর নিমাই পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলেন এবং কিছুদিন পদ্মাতীরে অধ্যাপনা করলেন। কিন্তু তিনি প্রবাসে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যু হল। গৃহে প্রত্যাগমনের পর মাতাকে কাতর দেখে এই বলে প্রবোধ দিলেন যে, 'অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে'। [চৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন দাস]। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত তিনি বেদান্তবাদীই ছিলেন। আবার নিমাই টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করলেন কিন্তু এই সময় তাঁর 'বায়ুরোগ' দেখা দিল, ঘন ঘন শিরঃপীড়া হয়। দুবছর পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ হল। তার তিন বছর পরে ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে নিমাই গয়ায় গেলেন পিতৃপিণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে। সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে তাঁর ভাবান্তর হল। তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিলেন এবং নবদ্বীপে ফিরে এসে কৃষ্ণনাম কণ্ঠে তুলে নিলেন। সেই সঙ্গে মূর্ছারোগ বৃদ্ধি পেল এবং সংসারে অনীহা দেখা দিল। অধ্যাপনা করেন কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যার আতিশয্য দেখে ছাত্ররা চঞ্চল হয়ে উঠল, নিমাইও পুথিপত্র গুটিয়ে পুরোপুরি কৃষ্ণনামে মগ্ন হলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের আশ্রমে সারারাতি কেটে যায় কৃষ্ণ গুণগানে। কিন্তু যবন ও পাষণ্ডীরা (শাক্ত ও শৈবরা) কৃষ্ণনামের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল; চাঁদ কাজি পাষণ্ডীদের প্ররোচনায়

কৃষ্ণনামের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন। নিমাই পণ্ডিত ক্ষিপ্ত হয়ে মশাল মিছিল নিয়ে হাজির হলেন চাঁদ কাজির আলয়ে; দরজা ভেঙে, বাগান তছনছ করে আগুন দিলেন বাড়িতে। কিন্তু তাতেও নিমাই-এর ক্রোধ শান্ত হয়নি। 'ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা। ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা' [চৈতন্য ভাগবত]। এই পর্বে নিমাই পণ্ডিতের আচরণ প্রায় মহাভারতের কৃষ্ণের মতোই। এই ঘটনা যে মুসলমান শাসনকালের মধ্যে এক স্পর্ধিত বিদ্রোহ তাতে সন্দেহ নাই। এরপরে কাজির উপদ্রব বন্ধ হল। এবং নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেল। এই প্রসঙ্গের মুল তাৎপর্য এই যে, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দেও নবদ্বীপে তথা বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম, হিন্দু সমাজে মোটেই গুরুত্ব পেত না এবং তা যে তন্ত্র ও বেদান্ত প্রভাব প্রসূত কারণে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু এখান থেকেই।

পূর্ব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে বৈষ্ণব ধর্ম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং শিবের চেয়ে বিষ্ণু বড়, এই মতবাদ নিযে তার যাত্রা শুরু। অথচ বাংলায় দেখছি তার বিপরীত অবস্থা। কেন? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে তৎকালীন সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের মধ্যে।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলে বাংলার শাসক। পূর্ববর্তী শাসক মুজাফফর শাহের মৃত্যু হয় ১৪৯৩ সালে। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মুজাফফর শাহের উজির ছিলেন হুসেন শাহ। ১৪৯৩-এর নভেম্বর থেকে ১৪৯৪-এর জুলাই-এর মধ্যে কোনও সময় হুসেন শাহ গদিতে বসেন। হুসেন শাহের কুল পরিচয় ও বাল্যাবস্থা সম্পর্কে নানা প্রচলিত কিংবদন্তি, বিভিন্ন গ্রন্থ, হুসেন শাহ কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রা ইত্যাদি বিচার করে রমেশচন্দ্র মজুমদার মশায় বলেছেন যে হুসেন শাহ সম্ভবত দু/এক পুরুষ আগে আরব থেকে আসা সৈয়দ গোষ্ঠীর এক দরিদ্র পরিবারের হিন্দু ও মুসলমান পিতার সন্তান, রংপুর জেলার দেবনগর গ্রামে জন্ম। বাল্যে তিনি সুবুদ্ধি রায় নামক এক ব্রাহ্মণের গোরক্ষকের কর্ম করতেন। সুবদ্ধি ছিলেন পুর্বতন সরকারের এক 'গৌড়ীয় আধিকারিক' বা সরকারি কর্মচারি। হুসেন শাহের সময়ে তাঁর পদোন্নতি হয় এবং এক আনা বাৎসরিক খাজনায় চাঁদপাড়া গ্রামের বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন, পরবর্তীকালে ওই গ্রামের নাম হয় এক আনি চাঁদপাড়া। কিন্তু কোনও কারণে হুসেন শাহ রুষ্ট হয়ে সুবুদ্ধির জাতি নাশে উদ্যত হলে, সুবুদ্ধি বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন। ওই সময় রূপ-সনাতন সুবুদ্ধির দুই সুহৃদ, কর্ণাটি ব্রাহ্মণ, দুই ভাই, হুসেন শাহের উজির ছিলেন এবং তাঁরাও পরবর্তীকালে অনুরূপ কারণে পালিয়ে যান ও বৃন্দাবনে বসবাস করতে থাকেন। এসবই ঘটেছে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস নেওয়ার অব্যবহিত পরে।

অপরদিকে হুসেন শা দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, দরবারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব সংহত করে নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। সেই পর্বে নবদ্বীপ ছিল একটি নদী বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র; ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাণিজ্যতরী নির্মিত হত বলে জানা যায়, কারিগরেরা হিন্দু সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সরকারি লোকেরা বাণিজ্য ও নৌ-নির্মাতাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করত, একথা ধরে নেওয়া যায় কিন্তু বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে

ছিল সে সম্পর্কে বৈষ্ণব সাহিত্যে কোনও তথ্য নেই। বৈষ্ণব পদ কর্তাদের মধ্যে কর্মকারও ছিলেন কিন্তু এ বিষয়ে আলোকপাত করেন নি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে কাজির উপরে আক্রমণের মতো গুরুতর বিষয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়ার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। অথচ অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপের নিকটস্থ পিয়ারপুর গ্রামের মুসলমান জনেদের চাঁদ কাজিকে পুরোহিত করার ঘটনার উল্লেখ সমসাময়িক সব বৈষ্ণব রচয়িতারা করেছেন। এ বিষয়ে লেখকের বিশ্লেষণ :

'হয়তো সংবাদ দেরিতে পৌঁছেছিল এবং স্বয়ং কাজি নিজের পিঠ বাচানোর জন্য ঘটনাটিকে লঘু করে দেখিয়েছিলেন। তাছাড়া তখন প্রায় চতুর্দিকে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ এবং দিল্লির সুলতানের সঙ্গে আশু সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সতর্ক চক্ষু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং চাঁদ কাজির প্রশাসন প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করেছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও হুসেন শাহের আরও উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। বৃন্দাবন দাস কবিরাজ ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। হয়তো একযোগে সকল হিন্দু কর্মচারীকে বৈরী করে তোলা সুবুদ্ধির কাজ মনে করেননি। যদিও এসকলই অনুমান তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতার উপরে দাঁড়িয়ে উক্তি যুক্তিসঙ্গত অনুমান।'

অপরদিকে বৃন্দাবন দাস ছাড়া সমসাময়িক রচনাকারেরা সকলেই ঘটনাটিকে লঘু করে দেখিয়েছেন বা এড়িয়ে গেছেন। হয়তো এই লঘুকরণ বা অনুল্লেখের পিছনে চাঁদ কাজির ইশারা ছিল। যাইহোক ওই একটিমাত্র হিংসাবৃত্তির প্রদর্শন ছাড়া গৌরাঙ্গ নিজেও আর দ্বিতীয় কোনও ঘটনা ঘটাননি বরং প্রেমবৃত্তিরই গুণগান করেছেন। বিশেষ গৌরাঙ্গের সহচর নিত্যানন্দ তো 'মেরেছো কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না'র জন্য বিখ্যাত। চৈতন্যদেব আদৌ রাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। নানক শাহি কিংবা ছত্রপতি শিবাজির মতো হিন্দু রাজ্য স্থাপনের কোনও সুদূরতম অভিলাষ গৌরাঙ্গ ও তার অনুচরদের ছিল, এমন ভাবার কোনও সূত্র নেই। সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়াও ক্রমশ স্তিমিত হয়েছে। যদিও শ্রীচৈতন্যের জীবনের আশঙ্কা ছিল এবং তাঁকে কোনও হিন্দু রাজার আশ্রয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, গৌরাঙ্গ সেই পরামর্শ মেনেই পুরীতে গিয়ে স্থিত হয়েছিলেন।

অতঃপর আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মীয় দর্শনের আলোচনায় প্রবেশ করব। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই পণ্ডিতের নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য নামেই কীর্তিত হয়েছেন। চৈতন্যের প্রথম দীক্ষা ঈশ্বরপুরীর কাছে। ঈশ্বরপুরী ছিলেন ভক্তিসাধক ও অযাচক বৃত্তিধারী সন্ন্যাসী; অর্থাৎ ভিক্ষা করতেন না, অযাচিত কেউ খাদ্য দিলে গ্রহণ করতেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস জীবনে এই বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন কিন্তু তীর্থ পরিভ্রমণ কালে অনুচরদের ভিক্ষায় নিষেধ করেননি তবে সঞ্চয়ের ঘোরতর বিরোধী, ভিক্ষান্ন বিলিয়ে দিতে হবে, এই ছিল তাঁর আদেশ। ঈশ্বরপুরীর কাছেই নামগানের দীক্ষা, আজীবন নামগানই ছিল তার সাধনক্রিয়া। গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে তেরোমাস নবদ্বীপে ছিলেন নামগানই ছিল

একমাত্র কৃত্য। প্রথমদিকে নামগান আখড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, নবদ্বীপবাসীকে নিজ নিজ প্রাঙ্গণে প্রতিবেশীদের নিয়ে নামগান করতে বলেন। কিন্তু চাঁদ কাজির সঙ্গে সংঘর্ষের পর নানা উপলক্ষ্যে নগর সংকীর্তন পরিচালনার মধ্যে দিয়ে নামগানকে সংগঠিত আন্দোলনের চেহারা দিতে পেরেছিলেন, যা ইতিপূর্বেই বিবৃত হয়েছে। নবদ্বীপ তথা সমগ্র বঙ্গে সংগঠিত সর্বজনীন ধর্মচর্যার একমাত্র প্রচলিত মার্গ হয়ে ওঠে নামগান। অদ্বৈতচার্য তাঁকে বেলেছিলেন স্ত্রী, শূদ্র এবং মূর্খদের মধ্যে ভক্তি বিতরণ করতে, 'আচণ্ডালে বিতর প্রেম'। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কাটোয়াবাসী কেশবভারতী অদ্বৈতবাদী দশনামি সম্প্রদায়ের সাধক, এরা নামগান করেন কিন্তু ঈশ্বরের দ্বৈত সত্তায় বিশ্বাস করেন না। শ্রীচৈতন্য দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুসরণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরলীলা করেন বহু সত্তায় বিভক্ত হয়ে। কখনও ঈশ্বর ধরা দেন বৎসরূপে মাতৃক্রোড়ে, মা যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। কখনও তিনি সখা, শ্রীদাম-সুদাম-বলরাম। প্রভুরূপেও তিনি আরাধনীয়; মীরা এই ধারার সাধিকা, 'মায়নে চাকর রাখো জী'। কিন্তু ভগবৎ প্রেমের শ্রেষ্ঠ তারিকা কান্তভাবের আরাধনা। বৈষ্ণবাচার্যের রাধাকে ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। [তন্ত্রপ্রভাব, লেখক] রাধার প্রেমার্তি কান্তরূপী ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত। শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন রাধা ভাবে ভাবিত, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য উন্মুখ, ব্যাকুল, ভাবোন্মাদ দশা। এই দশার মূল সুর বিরহ, কৃষ্ণকে না পাওয়া জন্য আক্ষেপ, কৃষ্ণ ব্যতিরেকে বিষাদমগ্নতা।

'পূজ্যে স্বনুরগা ভক্তি', পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ হল ভক্তি। এই ভক্তি যখন ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তখনি তা চরিতার্থ, সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। এই ভক্তিরই বৈষ্ণবীয় নাম 'রতি'। বৈষ্ণব মতে রতি পাঁচ প্রকারের; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরসে ঈশ্বরকে সবৈশ্বর্যশালী জ্ঞান করে বিষয় বাসনা বর্জন করে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ। এখানে ঈশ্বরের মহান রূপ, ভক্তের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, আছে শুধু শরণ। এই কৃষ্ণ পৌরাণিক কৃষ্ণ নন, ধরাছোঁয়ার মধ্যে তিনি নেই। সম্ভবত সব অধাত্ম্য ধর্মেরই এটি মূল সুর। বলাবাহুল্য শান্তরসের স্ফূর্তি বাংলার মাটিতে হয়নি, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এর কোনও উল্লেখ নেই। বাঙালি, মানুষের ঘরে দেবতার ঠাকুরালিতে অভ্যস্ত। এই ঠাকুরালি শিবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। শিবায়নের শিব চাষি, বাংলা ছড়ায় শিব সদাগর। গম্ভীরা গানে শিবের গেরস্থালির নানা চিত্র উদ্ধার করা হয়েছে। দাস্য রস এরই কাছাকাছি তবে এই রতির আরাধনা হল 'সেবা'। প্রভু উঁচুতলার লোক, কিন্তু প্রীতি উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা তাঁর কাছে আসা যায়। এই রতির দৃষ্টান্ত মীরা। কিন্তু বাংলায় এই রতি ও স্ফূর্তি লাভ করেনি। মীরার ভজন বলে যেগুলি গীত হয়, তা বঙ্গীয় জনের রচনা নয়। সখ্য হল সমপ্রাণতার রতি। দল বেঁধে পেয়ারা চুরি করে যখন বালকেরা, তখন সর্দারকে কিছু মান্য করে, তার প্রতি আস্থা অগাধ। আবদার করা যায় 'কৃষ্ণ ওই উঁচু ডালের ডাঁশ পেয়ারাটা পেড়ে দাও না গো'। দুরারোহ পাঁচিল টপকানোর সময় কৌশল বাতলানো যায়। হাঁটু ছড়ে গেলে দুর্বাচর্বণ করে লালাসিক্ত প্রলেপ দেওয়া যায়। এই রতিটি বাংলায়

মোটামুটি স্ফূর্তিলাভ করেছে। রাখালিয়া গান ও বাংলার বৈষ্ণব পদাবলিতে এর প্রকাশ দেখা যায়। 'সব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে।/ভাল ভাল করে মুখ হতে লয়ে সভে দেয় কানু মুখে।।' [বিশ্বম্ভর]। বাৎসল্য রসে বিপরীতমুখী পাল্য-পালক সম্পর্ক। ভগবান পালক নয়, ভক্ত পিতা ও মাতা হচ্ছে পালক। যত্ন করে, তাড়না করে, অল্পে ব্যাকুল হয়। মা যশোদা এই রতির পরাকাষ্ঠা। বাংলায় এই ঈশ্বর প্রাচীনার ঠাকুরঘরে নাড়ুগোপালের মূর্তি ধরে বিরাজিত। প্রাচীনা হেসে-কেঁদে বাতাসা-নকুলদানার নৈবেদ্যে তাকে নিয়ে পুতুল খেলা করে। আর সবার সেরা রতি হল 'মধুরারতি'। কানুরূপী কৃষ্ণের জন্য রাধা ভাবের রতি। শ্রীচৈতন্য এই রতির সাধক। পদাবলী সাহিত্যে, অজস্র লোকসংগীতে তার বিস্তার। বাংলার মাটিতে আক্ষরিক অর্থেই কানু বিনা গীত নাই। ধান ভানতে শিবের গীত, সেখানেও কানু প্রসঙ্গ উঁকি দেয়। গাজনের নানা গীত; গম্ভীরা থেকে বৈঠকী 'অষ্টক', সেখানেও কানু প্রসঙ্গ অপ্রতিরোধ্য। তবে এই কানু হল মধুরারতির কানু, কালাচাঁদ। মধুরারতির তিনটি প্রকার; সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থ। ভক্ত হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন, তাঁর সঙ্গসুখ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হল 'সাধারণী'। কুব্জা এক রাত্রির জন্য কৃষ্ণের সঙ্গসুখ কামনা করেছিলেন, ভক্তবৎসল কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁর সে কামনা চরিতার্থ হয়েছিল। সত্যভামা-রুক্মিনী তাঁকে পতিভাবে কামনা করেছিলেন এবং তাঁদের কামনা পূর্ণ হয়েছিল; এই রতি হল 'সমঞ্জসা'। ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধা এঁরা সমাজ-সংসার ভাসিয়ে দিয়ে পাগলিনীর মতো কৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হয়েছিলেন, এই রতি 'সমর্থ'। সমর্থ রতি বাহ্যত পরকীয়া; সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। বৃন্দাবন লীলার মূল সুর এই সমর্থ রতি। সমর্থ রতি যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি অনন্ত। এর আর পর নাই।

সমর্থ রতি সকাম রতি। গোবিন্দ দাসের একটি পদে পাই, 'কেন কহ কাম অনঙ্গ।/কেলি কদম্ব মূলে সো রতি নায়ক/পেখলুঁ নটবর ভঙ্গ।।' কিন্তু গোস্বামীদের ব্যাখ্যায় এই কামতৃষ্ণা বাহ্য, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ইন্দ্রিয় নির্ভর নয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যথা প্রিয়য়া স্ত্রীয়া সং পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ন অন্তরম : এবম এব অয়ং পুরুষ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সং পরিষ্বক্ত ন বাহ্য কিঞ্চন বেদ ন আপ্তরম; তদ্ বা অস্য এতৎ আপ্ত-কামম আতম কামম অকামং রূপং শোকান্তরম।' নিগলিতার্থ : প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ্য বা আন্তর কোনও ভেদ জ্ঞান থাকে না। প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত পরমাত্মার তেমনি বাহ্য বা আন্তর ভেদ জ্ঞান থাকে না। এই অবস্থায় পৌঁছালে সর্ব কমানার পরিতৃপ্তি হয়। রায় রামানন্দেরর শ্লোকে এই রাধাভাব ব্যক্ত হয়েছে সুচারু রূপে : 'নাসো রমণ, না হাম রমণী।/দুহুঁ মন মনোভাব পেষল জানি।।' রায় রামানন্দ বেদান্তবিদ ছিলেন, এই পদটি তারই প্রতিধ্বনি। এই পদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিফলন আছে বলে মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের দৈবোন্মাদ ভাবনা ছিল কৃষ্ণ বিরহ ও বিষাদক্ষিণ্ণতা। তাঁর ভাব বিরহ চরিতার্থ হয়েছিল এমন কোনও তথ্য নেই। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিধিবদ্ধ রূপের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের

সহজিয়া সাধন ধারা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিচারের প্রয়োজন আছে।

সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে বলে নেওয়া দরাকর যে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার বলে গৃহীত হবার আগে ছিলেন লৌকিক পুরুষ। শশীভূষণ দাশগুপ্ত মশায়ের অভিমত : 'ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতকগুলি রাখালিয়া গান রূপে ছড়াইয়াছিল। চপল আভীর বধূগণ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গান ছড়ার মাধ্যমেই হয়তো এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিবার পর বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপীলীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনী একটি ফল্গুধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেমসাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে ছিল বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের নাম বর্ণনার ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে।'

মহাভারতেই কৃষ্ণের অবতার তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণ ও বিষ্ণু সমার্থক বিবেচিত হতে থাকেন। কিন্তু শ্রীচৈতেন্যের ভাবানুভবে এবং বৈষ্ণবাচার্যদের ব্যাখ্যায় যে কৃষ্ণর দেখা পাওয়া গেছে, শ্রীচৈতন্য পূর্ব কৃষ্ণ তা থেকে ভিন্ন।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রচিত হালের 'গাথা সত্তসই'; নবম শতকে আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'; দশম শতকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক সংস্কৃত শ্লোকের সংকলন 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'; একাদশ শতকে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের 'দশকুমার চরিত'; এর পরে ত্রয়োদশ শতকে কবি জয়দেবের 'গোবিন্দমঙ্গল'; জয়দেবের সমসাময়িক কবি শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত'; হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসন'; রামচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণ'; কবি লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'; হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসন'; রামচন্দ্রের 'নাট্য দর্পণ'; কবি লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এবং পঞ্চদশ শতকের দুই সমসাময়িক কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় যে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে, তা আদৌ শ্রীচৈতন্যের ভাবানুভব বা বৈষ্ণবাচার্যদের বর্ণিত কৃষ্ণলীলা নয়; শৃঙ্গার ও উত্তেজক কামাচারের উপাখ্যান মাত্র।

চৈতন্যোত্তর অধ্যাত্ম দর্শনের নিষ্কাম কৃষ্ণ ভজনার পাশাপাশি লৌকিক স্তরে পূর্ব প্রভাবজাত রাসললীলার ধারাটিও জাগরুক ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব, শৈবাচারী বৈষ্ণব, বজ্রযানী বৌদ্ধ-জৈন এবং তান্ত্রিক বামাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে। রাসলীলার এই ফল্গু প্রবাহ থেকে অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে বাংলা লোকসংগীত; ঝুমুরে তা আবিল, ঘাঁটুতে বিকৃত। এইগুলি লোকসংগীতের নিকৃষ্ট ধারা। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ভাবানুভবের রাধা বিরহকাতর রূপটিও শূন্য থেকে পড়েনি, তার নান্দীমুখ আছে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনায় :

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব/কি করিব বারিদ মেহে।/এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়া ব/কি করব সো পিয়া লেহে।।/হরি হরি কো ইব দৈব দুরাশা।/সিন্ধু নিকট যদি কণ্ঠ

শুকায়ব/কোর করব পিয়াসা।।/চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়াব/শশধর বরিখিব আগি।/চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব/কি মোর করম অভাগি।।' [বিদ্যাপতি]

'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।/অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।/ঘর কইনু বাহির বাহির কইনু ঘর।/পর কইনু আপন আপন কইনু পর।।/রাত কইনু দিবস দিবস কইনু রাতি।/বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি।।/কোন বিধি সিরজিল শোতের শেওলি।/এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি।।/বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।/মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।' [চণ্ডীদাস]।

শ্রীচৈতন্য এই বিপ্রলম্ভ কলহকেই অলৌকিক করে তুলেছিলেন দিব্যোন্মাদ অবস্থায়। চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তাদের রচনায় এই রাধাকেই দেখি রাধাঠাকুরানি ভাবরূপিণী হ্লাদিনী শক্তি রূপে। ইনিই সেই লক্ষ্মী ও শ্রীরূপ বিষ্ণুশক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন বৃন্দাবন প্রবাসী ষড় গোস্বামী; রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস। এঁরা স্মার্ত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসরণে নানা বিধিনিয়ম ও ভেক-এর প্রবর্তন করেন, ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্যের সহজিয়া সাধন ধারা থেকে কিছুটা প্রতিসরিত হয় এবং পরবর্তীকালে মঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্য কোনও শাস্ত্র প্রণয়ন করেননি, বুদ্ধের মতো তাঁর বাণী সংকলিত হয়নি। বৈষ্ণব সাহিত্য বলতে বোঝায় একদিকে শ্রীচৈতন্যের জীবন বৃত্তান্ত, ভক্তি ও প্রেমের পদাবলি, দু-একটি নাটক; অপরদিক বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা।

শ্রীচৈতন্য নামগানের উদ্ভাবক নন, তা পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল, তিনি সেই উত্তরাধিকার আচরণ করেছিলেন আন্তরিক প্রত্যয়ের সঙ্গে। নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যাবল, নির্ভীক নেতৃত্ব, নায়কোচিত চেহারা, ভাবতন্ময়তা দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। আর এই প্রত্যয়ী ধরাকে নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করেছিলেন তাঁর সতীর্থ/-সহচরেরা। গৌড়জন সাগ্রহে এই ধর্মচর্যাকে মাথায় তুলে নিল। ঘরে ঘরে শুরু হল সংকীর্তন, আখড়ায় আখড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ কীর্তন, পথে পথে নগর সংকীর্তন। 'নামের সহিত সদা ফিরেন শ্রীহরি', নামগান করলেই তাঁকে পাবার পথ সুগম হবে। নীচকুলের মানুষ, স্ত্রীলোক নামগানের অধিকার পেলেন। প্রান্তবাসী বৌদ্ধজন ঠাঁই পেলেন সমাজে। জাতিচ্যুত-ধর্মান্তরিতদের গ্রহণ করা হল সাদরে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থজনের একটা অংশ সংস্কার ভেঙে নেমে দাঁড়ালেন ব্রাত্যজনের সঙ্গে এক পংক্তিতে। হিন্দু সমাজে ঘটে গেল মহা বিপ্লব।

একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে। হরিদাস ঠাকুর শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় এক দরিদ্র মুসলমান তাঁকে প্রতিপালন করেন এবং মুসলমানি রপ্ত করান। জ্ঞানলাভ করার পর হরিদাস হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে চাইলে, তাঁর উপর অত্যাচার নেমে আসে কিন্তু হিন্দু সমাজে তাঁর ঠাঁই হয়নি, তাঁকে গ্রহণ করেছিল চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ। হরিদাসের মাতৃশ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করেছিলেন স্বয়ং অদ্বৈতচার্য। সেই থেকে তাঁর পরিচয়

হল 'যবন হরিদাস', শ্রীচৈতন্যের নিত্য সহচর। পরে অবশ্য তাঁকে পরিত্যাগ করেন এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কাছে সেবার জন্যে চাউল গ্রহণ করার অপরাধে। ততদিনে চৈতন্য গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসীদের স্ত্রীমুখ দর্শন নিষিদ্ধ করেছেন। প্রকট দ্বিচারিতা! কারণ তিনিই স্ত্রীলোককে নামগানের অধিকার প্রদান করেন এবং বেশ কয়েকজন বৈষ্ণবী; বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উঠে আসেন, তাঁরা দীক্ষা নিতেও শুরু করেন। তাদের মধ্যে নিত্যানন্দ অবধূতের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা, ইত্যাদির উল্লেখ পাওযা যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে। পদকর্তা বল্লভদাস বলেছেন সঙ্ঘবদ্ধ কীর্তনে মহিলারাও অংশগ্রহণ করতেন। শিবানন্দ সেন-এর স্ত্রী প্রতিবছর রথযাত্রার সময় পুরী যেতেন চৈতন্যকে দর্শন করার জন্য। চৈতন্য হয়তো লক্ষ্মণের মতো তাঁর পদ দর্শন করতেন। এই গোঁড়ামি যে পূর্বাশ্রমের চৈতন্যের উদার দর্শনে কিছুটা চোনা নিক্ষেপ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিচারিতার ক্ষেত্র আরও বিশদ করা যেতে পারে। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের ক্ষুণ্নিবৃত্তির একমাত্র উপায় ভিক্ষাবৃত্তি, তিনি তো অনুচরদের ভিক্ষা নিষিদ্ধ করেননি বরং ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতেন পরম সন্তোষে। গৃহস্থের ভিক্ষা তো পুরলক্ষ্মীদের দ্বারাই বিতরিত হয়, শ্বশ্রূ-বধূ-কন্যা। বৈষ্ণবাচার্যেরাও ভিক্ষা নিষিদ্ধ করেন নি। পরবর্তীকালে নিষ্ঠাবান ভেকধারী বৈষ্ণবদের ধর্মাচারের অঙ্গ হয়ে ওঠে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে নাম ফেরি করে ভিক্ষা গ্রহণ, যা মাধুকরী নামে আখ্যাত। উদ্বুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবীরাও অনেক পদ রচনা করেছেন, রস মাধুর্যে-ভক্তিপরায়ণতায় তার তুলনা অল্পই আছে। তাছাড়া আগমনী গানের বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও, তা এই বৈষ্ণবীদেরই রচনা। আসলে চৈতন্য ক্রমেই চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলেন; রাধাভাবে বিভোর, কৃষ্ণবিরহে কাতর, দিব্যোন্মাদ! আধ্যাত্মিকতার এই চরম মার্গের কোনও কার্যকারিতাই ছিল না বাঙালির সমাজ জীবনে। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিবাস প্রমুখ চৈতন্যকে সামনে রেখে, কার্যত অগ্রাহ্য করে বাংলার মাটিতে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মচর্যাকে জাগ্রত রেখেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিকভাবে বাঙালি হিন্দু গ্লানিমুক্ত উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং এই উত্থান প্রায় শতবর্ষ স্থায়ী হয়। এই উজ্জীবন কার্যকর ছিল সাহিত্য-সংগীতে, পুতুল গড়ায় (ঝুটি বাঁধা গোয়ালিনি), মন্দির সজ্জায় (বিষ্ণুপুর ঘরানার বাংলা মন্দির), পটের ছবি (গৌরপট), সোলার কাজে (মালা—কদম ফুল), মিঠাইগড়ায় (মালপোয়া—গোকুল পিঠে) এমনকি বাণিজ্য কর্মে (মালা-চন্দন, বেলকাঠের কণ্ঠি, গঙ্গা মৃত্তিকা, রসকলির কাঠের ছাঁচ, ঘুনসি, সিন্দুর, মাথাঘষা ইত্যাদি ফেরি করা বিশিষ্ট বৃত্তি হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাই উপন্যাসের কুঞ্জ বোষ্টম)।

বৈষ্ণব চরিতকারেরা অবশ্য বলেছেন যে পরবর্তীকালে চৈতন্য, হরিদাসের সৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হযে মৃতের পদধূলি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই উক্তি প্রক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সুকুমার সেন মশাই একটি স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন, 'আগেকার দিনে সাধারণ বাঙালি সমাজে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে বৈষ্ণবেরাই মেয়ে-পুরুষে লেখাপড়া জানতেন।' অর্থাৎ

চৈতনোত্তর বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজ নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। স্মার্ত শাসনের আওতায় সেটা যে কত বড় কাজ, আধুনিক নারীশিক্ষার যুগে তা অনুধাবন করা সহজ নয়। পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গল-বিদ্যাসাগর-ব্রাহ্মসমাজ নারী শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়ায় বঙ্গীয় উচ্চকোটির মধ্যেও নারীশিক্ষা প্রসারিত হতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের তুঙ্গ সময়ে শুধু লেখাপড়ায় নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নারী জাগরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের হাত ধরে এই জাগরণের সূচনা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এইটিই সবচেয়ে সদর্থক দিক।

একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শের দ্বারা ভাবিত হয়ে যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, তার ভুরি পরিমাণ দৃষ্টান্ত আজ মধ্য-আধুনিক যুগে। খ্রিস্টীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ভিক্টর হুগো'র 'লো মিজারেবল'; লিও টলস্তয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পিস'; কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী গোকির 'মা'; নিকোলাই অস্ত্রভস্কির 'হাউ দা স্টিল ওয়াজ টেমপারড্'; আলেক্স তোলস্তয়ের 'ব্লিকমর্মিং'; চিন চিং মাই-এর 'সং অফ ওয়াং হাই'; তারই কয়েকটি। বৈষ্ণব মতাদর্শের শাসনের মধ্যেও তেমনি অজস্র পদ, স্থূল হিসাবে তার সংখ্যা সাত সহস্রাধিক। রচনায় আয়তনের সঙ্গে ঔৎকর্ষের সাজুয্য সর্বথা ঘটেনা। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলও অনেক বাজে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সাত সহস্রের মধ্যে সাতশত উৎকৃষ্ট পদই বা কম কি! ভাবের গভীরতা, ভাষার কারুকার্য তো বটেই বিক্ষিপ্তভাবে চাতুর্যেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস, জগদানন্দ, শশীশেখর, নরোত্তম দাস, বল্লভ দাস, কানাই, রামানন্দ বসু প্রমুখ বৃহৎ সংখ্যায় উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন।

কানাই একটি সরল চাতুর্যমণ্ডিত পদ উদ্ধৃত করা হল :

'মন চোরার বাঁশি বাজিও ধীরে ধীরে।/আকুল তোমার সুমধুর স্বরে।।/আমরা কুলের নারী হই/গুরুজনদের মাঝেরই/না বাজিও খলের বদনে।/আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক/না বধিয় অবলার প্রাণ।।/যে বা ছিল কুলাচার/সে গেল যমুনার পার/কেবল তোমার এই ডাকে।/যে আছে নিলাজ প্রাণ/শুনিয়া তোমার গান/পথে যাইতে থাকে না থাকে।।/তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর/ঠেকিয়াছে গোঙারের হাতে।/কানাই খুটিয়া কয়/মোর মনে হেন লয়/বাঁশি হইল অবলা বাধিতে।।'

শ্রীচৈতন্যের পূর্বকালেই কৃষ্ণকীর্তনের রেওয়াজ গড়ে ওঠে। জয়দেবের গীতগোবিন্দমের পদগুলি সুললিত ও লৌকিক ঠাটে গ্রথিত হওয়ায় মৃদঙ্গ সঙ্গত সহ সেগুলি গীত হত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদগুলিও গাওয়া হত। স্বয়ং চৈতন্য উভয়ের পদ আগ্রহ সহকারে শুনতেন। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যের সমসাময়িক কাল থেকে শুরু হয়, ক্রমশ পেশাদার (দক্ষ) কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গবাদক দেখা দেয়। শ্রীখণ্ডের পদকর্তা ও কীর্তনীয়া রামানন্দ প্রথম পদাবলি কীর্তনের বড় আসর করেন বলে শোনা যায় কিন্তু বিশদে কিছু জানা যায়নি। পরবর্তীকালে শ্রীখণ্ড কীর্তন গানের বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রামানন্দের প্রায় সমকালে নরোত্তম দাস বড় কীর্তনের আসর বসান এবং খোলবাদক দেবীদাসের সহযোগিতায় কীর্তন ও বাদনের ঠাট বেঁধে দেন। নরোত্তমের ঘরানাটি 'গরানহাটি' নামে পরিচিত।

শ্রীখণ্ডে যে ঘরানাটি গড়ে ওঠে তার নাম 'মনোহরশাহি'। বর্ধমানের রানিহাটির ঘরানাটি হল 'রেনেটি'। নরোত্তমের ঘরানাটি বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুটা ভিন্নরূপ ধারণ করে 'ঝাড়খণ্ডী' বলে অভিহিত হয়। ঝুমুর গানের আবিলতা এই ধারাকে আশ্রয় করেই দেখা দেয়। প্রথম দিকের পদাবলি কীর্তন সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পালাকীর্তনের রূপ ধারণ করে। রাধা-কৃষ্ণর বিভিন্ন শৃঙ্গার অবলম্বনে রচিত কতকগুলি পদ পরপর গাওয়া হত। যেমন 'মাথুর', 'রাম, 'নৌকাবিলাস' ইত্যাদি। পালাকীর্তন 'আখর' ও 'তুক' যোগে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আখর হল দুটি ছত্রের মধ্যবর্তী ব্যাখ্যামূলক গদ্যবাক্যের ব্যবহার। 'তুক' হচ্ছে দুটি ছত্রের মধ্যে ভাববিস্তারমূলক ছত্র যোগ করা। এর জন্যে শুধু দক্ষ গায়ক হলে চলবে না, কৃষ্ণ বিষয়ে যথেষ্ট দখল থাকা দরকার, অর্থাৎ উচ্চপর্যায়ের পেশাদারিত্ব। এবং তিনি ভক্ত হলে গানে যোগ হয় বিশেষ মাত্রা। তৎকালের সব কীর্তনীয়াই ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। আরও পরে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে দেখা দেয় ঢপকীর্তন, এই ঢপকীর্তনের দলে গাইয়ে নাচিয়ে স্ত্রীলোকও থাকতেন, তাদের বলা হত ঢপওয়ালি। সম্ভবত বাইজি নাচের আদলেই 'ঢপওয়ালি' দেখা দেয়। এঁদের পেশাদারিত্ব থাকলেও ভক্তি কতটা ছিল বলা মুশকিল। স্পষ্টতই ঢপকীর্তন একটি আদর্শ বিচ্যুত আবিল ধারা, বিলাসী জমিদারেরাই এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কৃষ্ণকীর্তনের পাশাপাশি চৈতন্যোত্তর যুগে শুরু হল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকীর্তন। ক্রমে পালাকীর্তনের প্রথমেই গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি পদ গাওয়ার রেওয়াজ গড়ে ওঠে, তার পারিভাষিক নাম 'গৌরচন্দ্রিকা'। বাংলা প্রকাশনার যুগে এই শব্দটি অর্থ পরিবর্তিত হয়ে মুখবন্ধ রূপে ব্যবহার হত, এখনও সেই অর্থেই প্রচলিত। কথ্যবাংলায় বাগবিস্তার এই ব্যাঙ্গার্থেও ব্যবহার হয়। গৌরচন্দ্রিকার ধারণাটি হিন্দু ক্রিয়াকর্মের নান্দীমুখ যজ্ঞের মতো। গৌরচন্দ্রিকাতেও উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারিত্বের প্রয়োজন হয়। সেকালের অধিকাংশ পদকর্তাই কীর্তনীয়া ছিলেন, ফলে তাঁরা আখর, তুক ও গৌরচন্দ্রিকার একটি সমৃদ্ধ ধারা গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে তাঁদের পদগুলি বিষয়বস্তু অনুসারে পরপর সংকলিত হওয়ায় সাধারণ কীর্তনীয়াদের কাছেও কাজটা সহজ হয়ে যায়। এমনকি রাধামোহন ঠাকুর তাঁর 'পদামৃত সমুদ্র' নামক সংকলনের অন্তর্ভুক্ত পদগুলির টীকাও লিখেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে।

এর বাইরে ভেকধারী বৈষ্ণবদের 'ছুটা কীর্তন' এবং 'প্রভাতফেরি', পদাবলি কীর্তনের অনুশাসন মান্য করেনি, তা গায়কীনির্ভর খোল করতালের সঙ্গতে ভক্তিরসাশ্রিত প্রাণের নির্যাস থেকে গেছে। প্রভাতফেরি ছুটাকীর্তনের রকমফের। এই গানের বৈশিষ্ট্য এই যে গানের কথায় ভোর হওযার বার্তা থাকবে। ছুটাকীর্তন এবং প্রভাতফেরির সাংগীতিক মূল্যও কিছু কম নয়।

নামগানেরও যথেষ্ট সাংগীতিক মূল ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম এবং শুক-সারির তরজা একসময় ভক্তজনের মুখে মুখে ফিরত।

চৈতন্য পরবর্তী সময়ে তন্ত্র প্রভাবিত 'বৈষ্ণবাচারী সম্প্রদায়ে'র (বৈষ্ণব নয়) মধ্যে হরি ও হরের অভিন্নতার ধারণা থেকে নাম সংকীর্তনের অতি পরিচিত 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ/কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে নাম/রাম রাম হরে হরে।' পদের সৃষ্টি হয়। এখনও বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুর শবযাত্রায় ও শ্রাদ্ধবাসরে এই পদ গীত হয়ে থাকে। এঁদের ধারণায় উমা ও রাধা সদৃশ, এঁদের মধ্যে 'আগমনী' গানের জন্ম। ঊনবিংশ শতকে যখন বর্ণ হিন্দু সমাজে শারদীয় দুর্গাপূজা ব্যাপক হল তখন ভেকধারী বৈষ্ণবীরা গেরস্থের বাড়ি বাড়ি আগমনী গেয়ে ভিক্ষা সেধে বেড়াতেন। উমার বাপের বাড়ি আসার আগাম আবহ তৈরি হত এই গানে। সুরমাধুর্য এবং বিষয়বস্তুর সরল প্রগাঢ় ভাব এই গানকে অত্যুচ্চ মাত্রায় তুলে নিয়ে গেছে। আপামর বাঙালি এই গানে বিভোর হয়ে উদাস নয়নে তাকিয়েছে, অশ্রুপাত করেছে। মা মেনকা; যশোদা, শচীদেবীর প্রতিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। 'গিরি এবার আমার উমা/আর উমায় পাঠাব না।/বলে বলবে লোকে মন্দ/কারও কথা শুনব না।।' আগমনী অভিধাটি বোধ হয় পরবর্তীকালের শিষ্ট প্রয়োগ, ছেলেবেলার স্মৃতি বলছে। গেরস্ত মেয়েরা বৈষ্ণবীকে ঘিরে 'উমা বিষয়' শোনানোর অনুরোধ জানাতেন। আগমনী গানে শুধুমাত্র খঞ্জনি বা ছোট করতালের সঙ্গত থাকে। গায়কি ও ভাব হল এর মর্মবস্তু। এ গানের রচয়িতা মুখ্যত বৈষ্ণবধারা; 'তখনকার দিনে বৈষ্ণবেরা মেয়ে পুরুষে লেখাপড়া জানতো'। আগমনীর জের হিসেবে গাওয়া হত 'বিজয়া'; 'নবমী নিশি রে ফুরায়োনা আর'।

আশ্চর্যের বিষয় হল, ঘুমপাড়ানি গানে হরি-হর দুজনেই অনুপস্থিত। বহু বিচিত্র প্রসঙ্গে গ্রথিত মুক্ত তালের গায়ক নির্ভর এই গানে ধর্মীয় প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। কেন, সে বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার।

দুঃখের বিষয় ছুটাকীর্তন, আগমনী-বিজয়া, প্রভাতফেরি হারিয়ে যেতে বসেছে। শহরে এসব গান শ্রুত হয় না। মফসসলে কদাচিত। সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়ার আগে এগুলির সংরক্ষণ হওয়া দরকার।

একসময় লিথোগ্রাফের দৌলতে গৌরপট ও কৃষ্ণপট ঘরে ঘরে শোভা পেত, এখন শুধুমাত্র দেয়ালপঞ্জিতে কদাচিত এদের দেখা মেলে। এদেরও সংরক্ষণ হওয়া দরকার।

চেরাকোটা ফলকে বিষ্ণুপুরী ঘরানার মন্দিরসজ্জার ধারাটিও লুপ্ত হয়ে গেছে। সূত্রধর সম্প্রদায়ের কাঠ খোদাই-এর ধারাটি ক্ষীণভাবে বেঁচে আছে মাত্র। টেরাকোটায় কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ বিষয় ছাড়াও কালী-দুর্গা-শিবালয় খোদিত হত। এখানেও সেই সমন্বয়ী প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। শিব বড় না বিষ্ণু বড় এই দ্বন্দ্বের চিরসমাপ্তি হয়েছে এই সব সমন্বয়ী চেষ্টার দ্বারাই। টিকে থাকা মন্দিরগুলির সার্বিক সংরক্ষণে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার।

হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবন স্থায়ী হয়নি তার তিনি কারণ : ১. চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মীয় দর্শনের মধ্যেই ছিল স্ববিরোধিতা। ষড় গোস্বামী ও অন্যান্য আচার্যেরা এই তত্ত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুটি দশার কথা বলা হয়েছে। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস, এই চারটি হল বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গারের মধ্যে দিয়ে মন প্রস্তুত

হয় সম্ভোগ বা মিলনের জন্য। সম্ভোগই চূড়ান্ত দশা, কিন্তু এই সম্ভোগ কায়িক নয় মানসিক। শৃঙ্গারের পূর্ণ বিকাশ পরকীয়াতে। সম্ভোগ পর্বে এসে রাধা বোঝেন, যে কৃষ্ণকে তিনি সর্বস্ব দিয়েছেন, তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই রাধা বলে ওঠেন, 'মাধব তুঁহুঁ কৈছে বাহবি মোয়।' এই কৃষ্ণ পরাৎপর অবাৎমানস গোচর, এই কৃষ্ণ প্রেমই বৈষ্ণবের সাধনা ও সিদ্ধি। তত্ত্বের দিক থেকে মারকে জয় করে অমরত্ব লাভের কথা তো শাক্যমুনিই বলে দিলেন। বাংলা সহজিয়া ধারাতেও কায়া সাধনার মধ্যে দিয়েই মোক্ষলাভের কথা বলা হয়েছে; অর্থাৎ কাম, মোক্ষলাভের উপায় মন্ত্র। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে মোক্ষলাভের কথা নেই, কৃষ্ণের নিত্যলীলার রস পান করাই তাঁর সাধনার উদ্দেশ্য। সেই নিত্যলীলার স্বাদ আবার কৃষ্ণের পর দেহেই সম্যকভাবে প্রকটিত বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জনের বিশ্বাস : 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা। নরবপু তাহার স্বরূপ।' [কৃষ্ণদাস কবিরাজ]। এখানে যেমন অভিনবত্ব তেমনই স্ববিরোধিতা। মোক্ষ যদি না চাই, পরকীয়া সাধনার কি দরকার! স্বকীয়াতেই তো পূর্ণ সম্ভোগ হতে পারে। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে (দশরূপক, সাহিত্য দর্শন) পরকীয়ার আনুমোদন নেই, 'ন অন্যোঢ়া, পরোঢ়া বর্জয়িত্বা'। রূপ গোস্বামীর 'ললিত মাধব' নাটকে রাধাকে কায়িকভাবে সত্যভামার আধারে স্থাপন করে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পরিণতি দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ পরোক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে পরকীয়াতত্ত্বের অসারত্ব। ব্যক্তিকে যৌন প্রেমের ভিত্তিই হল প্রকাসক্তি। অন্যপূর্বার মধ্যে যদিও একাসক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, বহুবল্লভ কৃষ্ণ, যে আনবাড়ি যায় তারই আঙিনা দিয়ে, তার মধ্যে এমনকি রাধা কোনওদিনই খুঁজে পায়নি, সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ তার জীবনে অনাস্বাদিত। তাহলে এই ট্রাজিক রাধাতত্ত্ব কেন? ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হলে মানুষকে সংসার বন্ধন তুচ্ছ করে কৃষ্ণ অভিমুখী হতে হবে, রাধিকার অভিসার সেই কৃষ্ণ অভিমুখী ধাবনের প্রতীক! পরকীয়াতত্ত্ব এসেছে সহজিয়া কথাতত্ত্ব থেকে। বৈষ্ণব দর্শনে তার রূপটি দাঁড়ালো : 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা/তারে বলি কাম।/কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা/ধরে প্রেম নাম।।' এই প্রেমই বৈষ্ণবের অভিষ্ট। এই জটিল তত্ত্ব সাধারণ মানুষের অনধিগম্য, তারা নামগানের জারকরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুদিন নাচানাচি করল, তারপর যথা নিয়মে শিথিল হয়ে গেল বিশ্বাসের ভিত, নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ক্রমশ সহজিয়াদের মতোই গুরুবাদী হল গুরুদের ব্যাভিচার থেকে গুরুপ্রসাদির মতো জঘন্য প্রথা। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কলকাতা নগরে প্রচলিত গুরুপ্রসাদির একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হয়েছে।

২. চৈতন্য দর্শনকে নথিবদ্ধ ও ব্যাখ্যা করে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ক্ষান্ত থাকেননি, স্মার্ত আচারের অনুসরণে কতগুলি আনুষ্ঠানিকতারও প্রচলন করেছিলেন; ভেক, চূড়াকরণ, কণ্ঠীবদল, মাধুকরী ইত্যাদি। স্বভাবতই এইসব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতেন গোস্বামীরাই। এই আনুষ্ঠানিকতাও গুরুবাদের ভিত্তি জুগিয়েছে। গৌড়ীয় গোস্বামী রাই মঠ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মঠগুলি সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; বৈষয়িকতা ও ব্যাভিচার তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বৌদ্ধ ও শৈব মঠগুলির ক্ষেত্রেও একই পরিণতি দেখা

গেছে। এলোকেশীর দৃষ্টান্ত এখনও জাজ্জ্বল্যমান। সবচেয়ে ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত জাতিভেদ প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। ষড় গোস্বামীর একজন যদুভট্ট বিধান দিলেন যে ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা কেবলমাত্র একজন ব্রাহ্মণ আচার্যই দিতে পারবেন, শূদ্র নয়। যদিও গোস্বামীদের প্রভাব প্রথমদিকে সেভাবে পড়েনি, নিত্যানন্দ প্রমুখ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উর্ধ্বে সমদর্শিতার ভিত্তিতেই নামগান ফেরি করে বেড়াতেন, কিন্তু তাঁদের দেহাবসানের পূর্বেই গোষ্ঠী বিভাজন শুরু হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীকালে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ষোলোকলা পূর্ণ হয় নবীন বৈষ্ণব ভক্ত শিক্ষার্থীদের বৃন্দাবন যাত্রায়।

৩. বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটা অংশ মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পাশাপাশি হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা তান্ত্রিক ও শৈব আচারের কিছু কিছু স্বীকার করে নিয়ে এবং কিছু লৌকিক দেবদেবীর পৌরহিত্যে অংশগ্রহণ করে নিম্নবর্গের একটা অংশকে সংহত করার কাজে নামেন। এর ফলে ভেকধারী বৈষ্ণবেরা আরও বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তবাসী হয়ে পড়েন।

ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে বহু বিচিত্র পেশা জন্মলাভ করে। তার মধ্যে অষ্টম প্রহর —২৪ প্রহরে গৃহস্থ বাড়িতে উপস্থিত হয়ে নামগান করা এখনও সর্ববঙ্গীয় ভিত্তিতে দেখা যায়। মেদিনীপুর শহরে দুটি বিচিত্র পেশার বৈষ্ণব জনকে নিযুক্ত দেখা যায়। প্রথমটি হল 'মদনমোহন', 'গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের দারু মূর্তি ভাড়া দেওয়া। তাঁরা নিজেরাই এই মূর্তি বহন করে নিয়ে যান এবং সাধারণ তিন দিন গৃহস্থবাড়িটিকে আখড়ায় পরিণত করে দেবতার সেবা-পূজা করে থাকেন। দ্বিতীয় পেশাটি হল নামগান সহ শবানুগমন শুধু নয় চিতা সাজানো, মৃতদেহে ঘৃতচন্দন লেপন, মুখ পিণ্ড দেওয়ানো, খুঁচিয়ে মড়া পোড়ানো, অদগ্ধ নাভি গঙ্গায় বিসর্জনার্থে উত্তোলন এবং কলসির জন্য চিতা নির্বাপণ পর্যন্ত এঁরা করে থাকেন।

তবু মরা হাতি লাখ টাকা। বৈষ্ণবগণেদের মধ্যে নারীশিক্ষা এবং তুলনামূলকভাবে নারীপুরুষের সমানাধিকার ঊনবিংশ শতকেও গণ্য করার মতো ছিল। স্বচ্ছল বৈষ্ণব পরিবারগুলিতে চৈতন্যজীবনী পাঠ ও কীর্তনে বহু ক্ষেত্রে নারীর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। জাতিচ্যুতদের ঠাঁই দেবার এবং কণ্ঠীবদল করে বিধবাদের বিবাহ দানের প্রথাও বলবৎ ছিল। একাদশী বৈরাগীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে (শরৎচন্দ্র)।

তবে একটা মারাত্মক ক্ষতির বীজও ছিল বৈষ্ণবচর্যার মধ্যে। তাঁরা শুধু নিমাই পণ্ডিতের শৌর্যের ব্যাপারটিই ধামাচাপা দেননি, বৈষ্ণবীয় বিনয় ও সর্বজনে প্রেমের যে শিক্ষা দিলেন, তাতে বাংলার ক্ষাত্রশক্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেল। দুলে-বাগদি-হাড়ি-ডোম, যারা এমনকি তুর্কি শাসকদের সমীহ আদায় করেছিল, তাদের একটা বড় অংশ বৈষ্ণব হয়ে, কণ্ঠি ধারণ করে সর্বদাই হাতজড়ো করে থাকে (শরৎচন্দ্রের নয়নজাতি)। কাঠিনাচ ছিল আখড়াই রণনৃত্য; বৈষ্ণব প্রভাবে তা হয়ে গেল গোপীসাজা কিশোরদের ললিত নৃত্য।

তাঁদের পক্ষে অবশ্যই কৈফিয়ত ছিল, অন্যথায় নামগানের মাধ্যমে সমাজসংস্কারের কাছে বিধর্মী রাজশক্তির দিক থেকে প্রবল বাধার আশঙ্কা।

শাক্তমতের কাছে বৈষ্ণব মতের পরাজয়ের এটাও একটা কারণ। স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল কালীপূজার মধ্যে দিয়ে। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় স্কুলগুলির বিভেদ পাকাপাকিভাবে মুছে যায়।

উৎসমুখ :

১. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন); খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২।

২. বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় নবপর্যায়; নীলরতন সেন, সাহিত্যলোক, ১৩০৭।

৩. History of Mediaeval Bengal; R.C. Majumder, G. Bharadwaj & Co, Reprint 1974.

৪. লেখকের পূর্ব রচনার অংশবিশেষ।

৫. অন্যান্য যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তাদের উল্লেখ লেখার মধ্যেই করা হয়েছে।